যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 987-984-8921-04-3

প্রথম প্রকাশ ঃ অগাস্ট ২০১১

তৃতীয় প্রকাশ ঃ শাবান ১৪৩৩
শ্রাবণ ১৪১৯
জুলাই ২০১২

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

Juge Juge Islami Andolon Written and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Kataban Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition August 2011 Third Edition July 2012 Price Taka 35.00 only.

প্রকাশকের কথা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাসনাধীন দশ বছর এবং খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন্ নাবুওয়াতের ত্রিশ বছর– এই চল্লিশটি বছর ছিলো ইসলামের সোনালী যুগ। অতপর ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহ্ বিচ্যুতির পথে এগুতে থাকে। তবে এই বিচ্যুতিকে রুখে দেবার জন্য সকল যুগেই আবির্ভূত হয়েছেন আপোসহীন সত্যনিষ্ঠ একদল মানুষ। তাঁদেরই কয়েকজনের অবদান সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্বলিত এই পুস্তিকা। আশ করি, এই পুস্তিকা খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন্ নাবুওয়াত পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আরো বেশি জানার আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচিপত্র

শুরুর কথা ॥ ৫
১। আল হুসাইন ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ॥ ৭
২। উমার ইবনু আবদিল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ৮
৩। আবু হানিফা আন নু'মান ইবনুস সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ১১
৪। আবু আবদিল্লাহ মালিক ইবনু আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ১৩
৫। আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ১৪
৬। তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আবদিল হালিম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ১৭
৭। আবুল বারাকাত বাদরুদ্দীন আহমাদ সরহিন্দি (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ২১
৮। আবুল ফাইয়াদ আহমাদ কুত্‌বুদ্দীন (শাহ ওয়ালীউল্লাহ) (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ২৫
৯। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ২৯
১০। শায়খ হাসানুল বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ৩৪
১১। বাদিউযযামান সাঈদ নুরসী (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ৩৯
১২। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহিমাহুল্লাহ) ॥ ৪৬
শেষের কথা ॥ ৫৪

بسم الله الرحمن الرحيم

যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন

শুরুর কথা

খৃস্টীয় ৬২২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলমাদীনা আলমুনাওয়ারা-কে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিলেন একটি ইসলামী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধান হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (খৃস্টীয় ৬২২-৬৩২ সন) দশ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

তাঁর ওফাতের পর আমীরুল মু'মিনীন বা খালীফা হিসেবে আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা) (খৃস্টীয় ৬৩২-৬৩৪ সন) দুই বছর তিন মাস দশ দিন রাষ্ট্রপ্রধান রূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

তাঁর ওফাতের পর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) (খৃস্টীয় ৬৩৪-৬৪৪ সন) দশ বছর ছয় মাস চারদিন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

তাঁর শাহাদাতের পর উসমান ইবনু আফফান (রা) (খৃস্টীয় ৬৪৪-৬৫৬ সন) রাষ্ট্র পরিচালনা করেন বার দিন কম বার বছর।

তাঁর শাহাদাতের পর আলী ইবনু আবী তালিব (রা) (খৃস্টীয় ৬৫৬-৬৬১ সন) চার বছর নয় মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

তাঁর শাহাদাতের পর আলহাসান ইবনু আলী (রা) (খৃস্টীয় ৬৬১ সন) ছয় মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিচালনাধীন দশ বছর আর খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন্ নাবুওয়াত ত্রিশ বছর–এই চল্লিশটি বছর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো ইসলামী শাসন। গড়ে উঠেছিলো সভ্যতার সোনালী অধ্যায়।

দুঃখের বিষয় উসমান ইবনু আফফানের (রা) শাহাদাতকে কেন্দ্র করে

মুসলিম উম্মাহ অন্তর্বিরোধের শিকার হয়। এক সময়ে এসে খিলাফাতের স্থান দখল করে রাজতান্ত্রিক শাসন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আলখুলাফাউর রাশিদূনের শাসনকালে আশশূরা ছিলো রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান।

রাজতান্ত্রিক শাসন কায়েম হয়ে যাবার পর আশ-শূরার এই মর্যাদা রইলো না। ক্রমশ দীনী নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পৃথক হয়ে যায়।

দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে কালের স্রোত। আলকুরআন ও আসসুন্নাহ থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন শাসকেরা। একই পথ ধরে শাসিতরাও। অ-মুসলিমদের জীবন দর্শন ও জীবনাচার প্রভাব ফেলতে শুরু করে মুসলিম উম্মাহর ওপর।

ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যা দানকারীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাঁরা মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে থাকেন নানা মত ও পথ। তাঁরা ইসলামকেই কাটছাঁট করে অথবা অন্য কোন চিন্তাধারার সাথে মিশ্রিত করে এমনভাবে পেশ করেছেন যে এতে ইসলামের আসল রূপ অবশিষ্ট থাকেনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দ্বারা মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে ইসলামের বিকৃত রূপ।

এরি পাশাপাশি সকল যুগেই এমন কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য, পূর্ণত্ব, চির নতুনত্ব ও কল্যাণময়তা সম্পর্কে ছিলেন নিঃসংশয়। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে আলকুরআন ও আস্সুন্নাহতে পরিবর্তন আনার কোন সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন ভ্রান্ত চিন্তাধারার অনুসারীদের চিন্তাধারার পরিবর্তন, তাদের চিন্তার বিশুদ্ধি সাধন।

আর চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের জন্য এবং সমাজ ও সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

এই সত্যনিষ্ঠ আপোসহীন ব্যক্তিদের কয়েকজনের অবদান আমার আলোচ্য বিষয়।

১। আল হুসাইন ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
খৃস্টীয় (৬২৬-৬৮০)

'খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন্ নাবুওয়াত' থেকে সরে যাওয়ার বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম আওয়াজ তোলেন আল হুসাইন ইবনু আলী (রা)।

এই বিচ্যুতিতে হিজাযের লোকেরা দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ ছিলেন।

ইরাক থেকেও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকে। শত শত বিশিষ্ট ব্যক্তি আল হুসাইন ইবনু আলীকে (রা) কুফা যাওয়ার জন্য চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিতে থাকেন।

তিনি কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

আল হুসাইন ইবনু আলী (রা) ইরাকের ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে কুফাস্থ গভর্ণর উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের প্রেরিত কয়েক হাজার সৈন্যের মুখোমুখি হন।

তাঁকে ইয়াযিদের পক্ষে বাই'য়াত গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। তিনি অস্বীকৃতি জানান। কেননা ইয়াযিদের নিকট বাই'য়াত গ্রহণের অর্থ ছিলো 'খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন নাবুওয়াত' থেকে বিচ্যুতিকে স্বীকৃতি দেওয়া। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোসহীন।

তাঁর সংগী ছিলেন পরিবারের সদস্য ছাড়া চুয়াত্তর জন। তাঁদের ওপর এবং খোদ আল হুসাইন ইবনু আলীর (রা) ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ করা হয়।

তীর বিদ্ধ রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

তাঁর দেহের ওপর ঘোড়া দাবড়ানো হয়। দেহ থেকে তাঁর মাথা কেটে নেওয়া হয়।

এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে খৃস্টীয় ৬৮০ সনে, হিজরী ৬১ সনে।

জীবন দিয়ে আল হুসাইন ইবনু আলী (রা) বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শিক্ষা দিয়ে গেলেন। ❖

২। উমার ইবনু আবদিল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ)
(খৃস্টীয় ৬৮০-৭২০)

উমার ইবনু আবদিল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন বানু উমাইয়ার অষ্টম খালীফা।

বানু উমাইয়া-র সপ্তম খালীফা সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী খালীফা মনোনীত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। কারণ তাঁর ছেলেরা সকলেই ছিলো ছোট ছোট। অবশেষে তিনি একটি গোপন ওয়াছিয়াতনামা লিখে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা রাজা ইবনু হায়ওয়া-র নিকট গচ্ছিত রাখেন। এতে লেখা ছিলো, তাঁর ওফাতের পর উমার ইবনু আবদিল আযীয খালীফা হবেন এবং তাঁর ওফাতের পর খালীফা হবেন ইয়াযিদ ইবনু আবদিল মালিক।

খৃস্টীয় ৭১৭ সনে সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক মারা যান। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে উমার ইবনু আবদিল আযীযের ওপর।

রাজধানী দামিসকে অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য একটি দিন ধার্য হয়। রাষ্ট্রের সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। সমবেত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে উমার ইবনু আবদিল আযীয একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, 'আমার ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অর্পণ করে আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আমি এটা চাইনি। এই ব্যাপারে আমার মতও নেওয়া হয়নি। আপনাদের ঘাড়ে আমার আনুগত্যের যেই রজ্জু পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আমি খুলে দিচ্ছি। এখন আপনারা যাকে ইচ্ছা তাকেই আপনাদের আমীর বানাতে পারেন।'

সমাবেশ থেকে জোর আওয়াজ ওঠলো, 'আমরা আপনাকেই চাই।'

এবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে উমার ইবনু আবদিল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, 'আসলে রব, নবী ও কিতাবের ব্যাপারে এই উম্মাহর মধ্যে বিরোধ

নেই। বিরোধ শুধু দীনার-দিরহামের ব্যাপারে। আল্লাহর কসম, আমি অন্যায়ভাবে কাউকে কিছু দেবোনা, আবার কারো বৈধ অধিকারে বাধাও দেবোনা। ওহে জনমন্ডলী, শুনুন। যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করেনা, তার জন্য কোন আনুগত্য নেই। যতোক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করি, ততোক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে, আমার আনুগত্য করা আপনাদের জন্য ওয়াজিব নয়।'

এবার উমার ইবনু আবদিল আযীয ইছলাহে হুকুমাত শুরু করেন।

তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য দেহরক্ষী বাহিনী এগিয়ে এলে তিনি তাদেরকে ফেরত পাঠান।

বানু উমাইয়া যেইসব সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করেছিলো, তিনি সেইগুলো প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত যালিম গভর্ণরদেরকে বরখাস্ত করেন।

জনগণের ওপর অন্যায়ভাবে যেইসব ট্যাকস চাপানো হয়েছিলো, সেইগুলো রহিত করেন।

নও-মুসলিমদের ওপর অন্যায়ভাবে ধার্যকৃত জিয্ইয়া রহিত করেন।

অ-মুসলিমদের দখলকৃত উপাসনালয় তাদেরকে ফেরত দেন।

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করে দেন।

সর্বজনীন শিক্ষার জন্য গণ-শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন।

জনগণকে ইসলাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে তোলার জন্য দেশের সর্বত্র মুবাল্লিগ নিযুক্ত করেন।

রাষ্ট্রীয়ভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছগুলো সংগ্রহ ও একত্রিত করার অভিযান শুরু করার জন্য একদল বিশেষজ্ঞের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

ইসলামে পারদর্শী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আশ শূরা গঠন করেন। ইত্যাদি।

সন্দেহ নেই, উমার ইবনু আবদিল আযীয ছিলেন একজন সাহসী পুরুষ, একজন কর্মবীর।

মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই তিনি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসেন। চারদিকে খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন নাবুওয়াতের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

নিষ্ঠাবান মুসলিমরা উল্লসিত হন। কিন্তু বানু উমাইয়া নাখোশ হয়।

বানু উমাইয়ার কিছু দুষ্ট লোক চক্রান্তে মেতে ওঠে। তারা তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়।

খৃস্টীয় ৭২০ সনে উমার ইবনু আবদিল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) দামিসকে শাহাদাত বরণ করেন। ❖

৩। আবু হানিফা আন নু'মান ইবনুস সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ)
(খৃস্টীয় ৬৯৯-৭৬৭)

খৃস্টীয় ৬৯৯ সনে আবু হানিফা বানু উমাইয়া খালীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনকালে কুফাতে জন্ম গ্রহণ করেন। আবু হানিফা যখন যৌবনে পৌঁছেন তখন উমার ইবনু আবদিল আযীযের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাঁর নির্দেশে আল হাদীছ সংগ্রহের যেই অভিযান শুরু হয় তা পুরোদমে চলছিলো।

হাদীছ বিশারদদের একদল ছিলেন সংগ্রাহক। অপর দল ছিলেন বিশ্লেষক। আবু হানিফা ছিলেন দ্বিতীয় দলের একজন।

খৃস্টীয় ৭৫০ সনে বানু উমাইয়া খিলাফাতের অবসান ঘটে। শুরু হয় বানুল আব্বাস খিলাফাত।

আবু হানিফা বানুল আব্বাসের দ্বিতীয় খালীফা আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মানছুরের শাসনকালের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ওই সময় খারেজী, মুতাযিলা ও মুর্যিয়া নামে বিভিন্ন চিন্তাধারার নেতা ও কর্মীরা ঈমান, কুফর, খিলাফাতে রাশেদা এবং ছাহাবীদের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে বিভ্রান্তিকর চিন্তা ছড়াতে থাকে। আবু হানিফা এইসব মতবাদের ভ্রান্তি উন্মোচন করে সঠিক চিন্তাধারা উপস্থাপন করেন।

রাষ্ট্র দর্শনের অন্যতম মৌলিক বিষয় হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এই বিষয়ে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত মতবাদই ছিলো আবু হানিফার মতবাদ। অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।

আইনের উৎস সম্পর্কেও তিনি সঠিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কিতাবে কোন বিধান পেলে আমি তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করি। আল্লাহর কিতাবে সেই বিধানের সন্ধান না পেলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ গ্রহণ করি। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহতে কোন বিধান না পেলে আছহাবে রাসূলের ইজমা অনুসরণ করি। আর কোন বিষয়ে তাঁদের মাঝে মত-পার্থক্য থাকলে কোন ছাহাবীর মত গ্রহণ করি ও ভিন্ন মত পোষণকারী

ছাহাবীর মত গ্রহণ করিনা। তাঁদের বাইরে অন্য কারো মত গ্রহণ করিনা। বাকি রইলো অন্যান্যদের মত। ইজতিহাদের অধিকার তাঁদের যেমন আছে, তেমনি অধিকার আমারও আছে।'

খিলাফাতে রাশেদার পর আশ্ শূরার অবিদ্যমানতার ফলে আইন ব্যবস্থায় শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটছিলো। নিজেদের সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই বহু জনগোষ্ঠী মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিলো।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক লেনদেন, শুল্ক, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয়ক নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিলো। অথচ কোন স্বীকৃত সংস্থা ছিলো না যেখানে বসে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ সেইসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন।

এই শূন্যতা পূরণের জন্য আবু-হানিফা একটি সংস্থা গড়ে তোলেন যেটিকে একটি বে-সরকারী আইন পরিষদ বলা যায়।

আবু হানিফার কয়েক হাজার ছাত্রের মধ্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন ৩৬ জন। তাঁদের মাজলিস বসতো প্রতিদিন। একটি সমস্যা নিয়ে কয়েক দিন কিংবা কয়েক মাস ধরে আলোচনা হতো। আলোচনান্তে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। এই মাজলিস হাজার হাজার সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। আবু হানিফার শিক্ষা মাজলিস থেকে আহরিত জ্ঞান নিয়ে হাজার হাজার ছাত্র রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন।

বানু উমাইয়ার সর্বশেষ খালীফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের গভর্ণর ছিলেন ইয়াযিদ ইবনু উমার ইবনু হুবাইরা। তিনি ইমাম আবু হানিফাকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেন। ইমাম সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ইয়াযিদ ইবনু উমার ক্ষেপে যান। তাঁর নির্দেশে প্রতিদিন দশটি করে ১১ দিন পর্যন্ত তাঁর পিঠে ১১০টি চাবুক মারা হয়। এতো বড়ো শাস্তির পরও ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

বানুল আব্বাস খালীফা আল মানছুর আবু হানিফাকে বিচারপতি বানাতে চান। তিনি রাজি হননি। এইজন্য তাকে বন্দি করা হয়।

খৃস্টীয় ৭৬৭ সনে তিনি বন্দি অবস্থায় বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। ❖

৪। আবু আবদিল্লাহ্ মালিক ইবনু আনাস (রাহিমাহুল্লাহ্) (খৃস্টীয় ৭১৪-৭৯৮)

খৃস্টীয় ৭১৪ সনে বানু উমাইয়া খালীফা আলওয়ালীদ ইবনু আবদিল মালিকের শাসনকালে ইমাম মালিক ইবনু আনাস আল মাদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। বানুল আব্বাস খালীফা হারুনুর রশীদের শাসনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উমার ইবনু আবদিল আযীযের মুত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ছয় বছর। যৌবনে পৌঁছে তিনি আল হাদীছ সংগ্রহের অভিযান প্রত্যক্ষ করেন।

আল হাদীছ সংগ্রহ এবং আল হাদীছ বিশ্লেষণ-এই দুই ধারার সাথেই তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিলো। তবে দ্বিতীয় ধারাটির সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিলো বেশি। তাঁর প্রণীত হাদীছ সংকলনের নাম 'আলমুওয়াত্তা'।

আল হাসান ইবনু আলী (রা) বংশীয় মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ, যাঁকে 'আন্ নাফসুয্ যাকিয়া' বলা হতো, খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন নাবুওয়াত' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রতি মালিক ইবনু আনাসের সমর্থন রয়েছে অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং আল মাদীনার গভর্ণরের নির্দেশে তাঁর পিঠে চাবুক মারা হয়।

ইমাম মালিক সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করতেন যে জোর করে ক্ষমতা দখল করা বৈধ নয়। তাঁর এই স্পষ্ট উক্তিতে বানুল আব্বাস খালীফা আল মানছুর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁকে বন্দি করে এনে চাবুক মারা হয়। তাঁর হাত পেছনে এমন শক্তভাবে বাঁধা হয়েছিলো যে কনুইয়ের জোড়া শিথিল হয়ে যায়। এই জন্য বাকি জীবন তিনি দারুণ কষ্ট ভোগ করেন।

খৃস্টীয় ৭৯৮ সনে তিনি খালীফা হারুনুর রশীদের শাসনকালে আলমাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। ❖

৫। আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) (খৃস্টীয় ৭৮০-৮৮৫)

খৃস্টীয় ৭৮০ সনে বানুল আব্বাস খালীফা মুহাম্মাদ আল মাহদীর শাসনকালে আহমাদ ইবনু হাম্বল বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন।

খালীফা আল মামুনের শাসনকালে গ্রীক দর্শন ও ভারতীয় দর্শন প্রবল বেগে মুসলিম জাহানে প্রবেশ করে। আল মামুন গ্রীসের রাজধানী এথেন্স থেকে গ্রীক ভাষায় রচিত দর্শনের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে এনে কোস্টা নামক এক ব্যক্তিকে সেইগুলো আরবীতে অনুবাদের দায়িত্ব দেন। অনুরূপভাবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় দর্শনের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে এনে দুবান নামক একজন ব্রাহ্মণকে সেইগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব দেন।

বানু উমাইয়া খিলাফাতকালে প্রখ্যাত তাবে'য়ী আল হাসান আল বাছরীর (রাহিমাহুল্লাহ) শিক্ষা মাজলিস বসতো বাছরাতে। এই মাজলিসের অন্যতম ছাত্র ছিলো ওয়াসিল ইবনু 'আতা। তার ভ্রান্ত চিন্তার পরিচয় পেয়ে আল হাসান আল বাছরী তাকে তাঁর শিক্ষা মাজলিস থেকে বের করে দেন। এই ওয়াসিল ইবনু 'আতা-ই হচ্ছে মুতাযিলাবাদের প্রবর্তক। বানুল আব্বাস খালীফা আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় মুতাযিলাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুতাযিলারা বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হয়। মুতাযিলা তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন মাসজিদে ও শিক্ষালয়ে গিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মত প্রচার করতে থাকে।

মুতাযিলারা বলতো, আল কুরআন একটি সৃষ্ট বস্তু। মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন চিরস্থায়ী বিধি নেই। আসমানী অনুশাসন গুলোও পরিবর্তনের অধীন। তারা আখিরাতে মানুষের শারীরিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না। তারা জান্নাতে আল্লাহকে মানবীয় চোখে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করতো না। তারা ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে আল হাদীছ ও আল ইজমাকে প্রায় বাতিল বলে গণ্য করতো। ইত্যাদি।

এই চিন্তার বিভ্রান্তিকে রুখে দেওয়ার জন্য ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। তিনি একদিকে গ্রীক দর্শন ও ভারতীয় দর্শন, অন্যদিকে মুতাযিলাবাদের সমালোচনা করে লোকদেরকে আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর স্বচ্ছ ধারার অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানান।

আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, আল্লাহর সঠিক পরিচয় একমাত্র আল কুরআনেই রয়েছে। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে আল কুরআনে আল্লাহ নিজের যেই রূপ পরিচয় তুলে ধরেছেন সেইভাবে তাঁকে মানা। আল্লাহর গুণাবলী এবং সার্বভৌমত্ব সঠিক বলে মেনে নিলেই চলবে না, আল্লাহর সত্তা, আল্লাহর আরশ, আখিরাতে মুমিনদেরকে তাঁর দর্শন দান ইত্যাদিও বিশ্বাস করতে হবে। আরো বিশ্বাস করতে হবে যে বিশ্ব জাহানের কোন কিছুরই আল্লাহর সাথে কোন সাদৃশ্য নেই।

আহমাদ ইবনু হাম্বল দৃঢ়ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করতেন যে, আল কুরআন সৃষ্ট বস্তু নয়, এটি আল্লাহর চিরন্তন বাণী।

তিনি আরো বলতেন, আল কুরআনের শব্দাবলীর প্রত্যক্ষ অর্থ বাদ দিয়ে কোন পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। আল হাদীছকেও সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে। এই দুইটির পর আছহাবে রাসূলের অভিমতকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ আছহাবে রাসূল পরবর্তী কালের লোকদের তুলনায় আল কুরআন ও আল হাদীছে অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁরা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল কুরআন ও আল হাদীছের নির্দেশগুলো অনুসরণ করতেন।

প্রশাসনে জেঁকে বসা মুতাযিলারা চক্রান্তে মেতে ওঠে। ওই সময় খালীফা আল মামুন তারসুসে অবস্থান করছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে গ্রেফতার করে শিকল পরিয়ে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। পথিমধ্যে খবর পাওয়া যায় যে আল মামুন মারা গেছেন। তখন ইমাম ইবনু হাম্মলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী খালীফা আল মুতাসিমবিল্লাহ মুতাযিলাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে আবার গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

একদিন খালীফা আল মুতাসিমবিল্লাহর নির্দেশে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে দরবারে আনা হয়। উদ্দেশ্য ছিলোঃ তাঁর কাছ থেকে মুতাযিলাবাদের পক্ষে সমর্থন আদায়। তিনি মুতাযিলাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। খালীফার নির্দেশে তাঁর পিঠে চাবুক মারা শুরু হয়। তিনি অবিচল থাকেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে আবারো চাবুক মারা হয়। অতপর তাঁকে জেল খানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবার জেলে থাকতে হয় দুই বছর। দুই বছর পর মুক্তি দিয়ে তাঁকে স্বীয় গৃহে নজরবন্দি করে রাখা হয়।

পরবর্তী খালীফা আলওয়াসিক বিল্লাহর শাসনকালেও তাঁকে দৈহিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কিন্তু বারবার নির্যাতিত হয়েও তিনি নিরেট যুক্তিবাদীদের অযৌক্তিক বক্তব্যের কাছে আল কুরআন ও আল হাদীছের শিক্ষাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হননি।

খৃস্টীয় ৮৪৮ সনে খালীফা হন আল মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ। সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি মুতাযিলাবাদের ভ্রান্তি বুঝতে সক্ষম হন এবং সালফে ছালেহীনের চিন্তাধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেন। তাঁর শাসন কালে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল স্বস্তি লাভ করেন।

বানু উমাইয়া খালীফা উমার ইবনু আবদিল আযীযের নির্দেশে আল হাদীছ সংগ্রহের যেই প্রবাহ শুরু হয়েছিলো, তিনি সেই প্রবাহে নিজকে সংশ্লিষ্ট করেন। তিনি ঊনত্রিশ হাজার হাদীছ সম্বলিত একটি সংকলন তৈরি করেন যার নাম মুসনাদে আহমাদ।

খৃস্টীয় ৮৮৫ সনে আলমুতামিদ 'আলাল্লাহর-র শাসনকালে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। ❖

৬। তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আবদিল হালিম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) (খৃস্টীয় ১২৬৩-১৩২৮)

খৃস্টীয় ১২১৯ সনে তেমুজিন বা চেংগিস খান মংগোলিয়ার সকল অঞ্চল ও চীন দখল করে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জনপদে হামলা চালাতে থাকেন।

মধ্য এশিয়া ও ইরানকে বিরাণভূমিতে পরিণত করে চেংগিস খান দেশে ফিরে গিয়ে মারা যান।

ইরানে নতুন হামলা চালান তাঁর পুত্র মংগু খান।

খৃস্টীয় ১২৫৮ সনে চেংগিস খানের অপর পুত্র হালাকু খান বানুল আব্বাস খিলাফাতের রাজধানী বাগদাদ দখল করে ২০ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ১৬ লাখকে হত্যা করেন।

তছনছ করে ফেলা হয় সব কিছু।

খালীফা আল মুসতাসিম বিল্লাহ, তাঁর পুত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি গণকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

বাগদাদ নগরীর পতনের পাঁচ বছর পর খৃস্টীয় ১২৬৩ সনে সিরিয়ার হাররান শহরে ইমাম ইবনু তাইমিয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

খৃস্টীয় ১৩০২ সনে তাতারদের নেতা কাজান সিরিয়া ও মিসর দখল করার অভিপ্রায় নিয়ে দামিসক আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া সুলতান আল মালিকুন্ নাছির মুহাম্মাদ ইবনু কালাউন-কে আলজিহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হন। তাতার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়া তাঁর ছাত্রদেরকে নিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে তাতার বাহিনী পেছনে সরে যায়। সিরিয়া ও মিসরের স্বাধীনতা রক্ষা পায়। এই স্বাধীনতা রক্ষার পেছনে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার অবদান ছিলো অনেক বড়ো।

খৃস্টীয় ১৩০৬ সনে ইমাম ইবনু তাইমিয়া মিসরের রাজধানী কায়রো

আসেন। আল্লাহর প্রতি মানবীয় গুণ আরোপের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর কারাদণ্ড ঘোষিত হয়। মাটির নিচে একটি কুঠরিতে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়।

দেড় বছর তিনি জেলে থাকেন। জেল থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি দামিসকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এক মানযিল পথ অতিক্রম করার পর সরকারি লোকজন এসে তাঁকে আবার গ্রেফতার করে। এবারো তাঁকে জেলে থাকতে হয় দেড় বছর।

দেড় বছর পর মুক্তি দিয়ে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। এবার তাঁকে রাখা হয় আলেকজান্দ্রিয়া দুর্গে। আট মাস পর তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

অতপর তিনি দামিসক আসেন।

তাঁর শার'য়ী দৃষ্টিভংগি বিদ'আতপন্থী এবং বিদ'আত পন্থীদের প্রভাবে প্রভাবিত শাসকদের পছন্দনীয় ছিলো না বিধায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

পাঁচ মাস আঠার দিন তিনি দামিসকের দুর্গে বন্দি জীবন যাপন করেন। অতপর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এবার কয়েকটি বছর তিনি নির্বিঘ্নে দা'য়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

এরপর তাঁকে আবার গ্রেফতার করে দামিসকের দুর্গে রাখা হয়। জেল খানায় বসে ইমাম ইবনু তাইমিয়া লেখালেখি করতে থাকেন।

তিনি চল্লিশ খণ্ডে একটি তাফসীর লিখেছিলেন। নাম ছিলো 'আল বাহরুল মুহীত'। দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য তাফসীরের পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। তিনি প্রায় পাঁচশত বই লিখেছেন।

ইবনু তাইমিয়ার জন্মের দশ বছর আগে নাসিরুদ্দীন তূসীর মৃত্যু হয়। কিন্তু নাসিরুদ্দীন তূসী ও তার অনুসারীদের গ্রীক দর্শন চর্চা মুসলিম জাহানে চিন্তার বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়। ইবনু আরাবী নামের এক ব্যক্তি 'ওয়াহদাতুল উজুদ' বা সর্বেশ্বরবাদ তত্ব প্রচার করে বহু মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে। নুছাইরী শি'য়াদেরও তখন ভারী উপদ্রব।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া তাদের চিন্তার বিভ্রান্তি উন্মোচন করে বই লেখেন, বক্তৃতা-ভাষণ দিতে থাকেন। তাঁর ছাত্রগণ জনগণের নিকট ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে থাকেন।

ইবনু তাইমিয়া আলকুরআন ও আলহাদীছের আক্ষরিক অর্থকে প্রাধান্য দিতেন এবং টেনেটুনে অর্থ বের করা ঘৃণা করতেন।

ইবনু তাইমিয়া বলতেন, আল্লাহর হাত, পা ইত্যাদি আছে। তিনি আরশের ওপর সমাসীন। তবে অবশ্যই সেইগুলো তেমন যেমন তাঁর জন্য সাজে। যাঁরা আল্লাহকে মানুষের মতো শরীরী মনে করেন বা সৃষ্ট কোন কিছুকে তাঁর অনুরূপ মনে করেন তাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বলেন না।

ইবনু তাইমিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগত থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। সৃষ্টি জগতে তাঁর সত্তার যেমন কোন অংশ নেই, তেমনি তাঁর সত্তার মাঝেও সৃষ্টি জগতের কোন অংশ নেই।

আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, রাসূলের প্রতি মানুষকে অবশ্যই এমন ঈমান আনতে হবে যাতে কোন শর্ত যোগ হবে না। আল্লাহর রাসূলের প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রতিটি নির্দেশ পালন করতে হবে।

আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য-বিরোধী প্রতিটি কথাকে মিথ্যা ও বাতিল গণ্য করতে হবে। যেই ব্যক্তি নিজের আকল-বুদ্ধির সম্মতি সাপেক্ষে রাসূলের কথা বিশ্বাস করে এবং আকল ও যুক্তির অনুমোদন না পেলে রাসূলের কথা প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ বুদ্ধি ও যুক্তিকেই রাসূলের বক্তব্যের মুকাবিলায় প্রাধান্য দেয়, আবার রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণের দাবিও করে, সেটা তার চরম স্ব-বিরোধিতা, বুদ্ধিভ্রষ্টতা ও ধর্মহীনতা। তদ্রূপ যেই ব্যক্তি বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে আশ্বস্ত না হয়ে রাসূলের কথা বিশ্বাস করবে না বলে থাকে, তাঁর কুফরের ব্যাপারে কোন দ্ব্যর্থতা নেই।

ইবনু তাইমিয়া খারিজী, রাফিয়ী, মুতাযিলা, জাহামি, মুরযিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলোর ভ্রান্তি উন্মোচন করেন। তিনি উগ্রপন্থী শি'য়াদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোসহীন ছিলেন। তিনি নাচ-গানের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি আরো বলেন,

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আছহাবে রাসূল কোন গানের আসর বসাতেন না। তবে বিয়ের মতো অনুষ্ঠানে দফ্ বাজিয়ে মেয়েদের কিছু গাওয়াকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমোদন দিয়েছেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো মুসলিমদেরকে আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর দিকে আহ্বান জানানো। তিনি বলতেন, 'আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর দিকে ফিরে আস। এর বাইরে রয়েছে ফিসক, বিদ'আত, শিরক ও কুফর।'

ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'রাষ্ট্রের নেতৃত্ব জনগণের রায়ের ভিত্তিতে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জনগণ যখন কারো হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে তখন তিনি রাষ্ট্র প্রধান হতে পারেন, পূর্ববর্তী কোন পদাধিকার বলে নয়।'

তিনি বলেন, 'দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফারযে আইন। যাঁর ওপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শাসনভার ন্যস্ত তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক। আল্লাহর আনুগত্য, ইকামাতুদ্ দীন এবং শাসিতদের কল্যাণ সাধনই তো রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য।'

খৃস্টীয় ১৩২৮ সনে ইমাম ইবনু তাইমিয়া দামিসকে মৃত্যুবরণ করেন। ❖

৭। আবুল বারাকাত বাদরুদ্দীন আহমাদ সরহিন্দি (রাহিমাহুল্লাহ) (খৃস্টীয় ১৫৬৩-১৬২৪)

খৃস্টীয় ১৫৬৩ সনে শায়খ আহমাদ সরহিন্দি ভারতের তৃতীয় মুগল সম্রাট আকবারের শাসনকালে পূর্ব পাঞ্জাবের পাতিয়ালা রাজ্যের সরহিন্দ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

এই সময় রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য দেব প্রমুখের প্রচারিত 'ভক্তিবাদ' তথা 'ধর্মীয় আচার নয়, ভক্তিতেই মুক্তি'- বহু সংখ্যক লোককে বিভ্রান্ত করে ফেলে। বিভিন্ন ধর্মের বহু অনুসারী এই মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে বিকৃত সুফীবাদ মুসলিমদেরকে বিপথগামী করে চলছিলো।

ওই সময় 'আলফিয়াহ' নামে একটি মতবাদও প্রচারিত হতে থাকে। এই মতবাদের বক্তব্য ছিলো ঃ ইসলাম এসেছিলো এক হাজার বছরের জন্য। এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন নতুন দীনের প্রয়োজন।

সম্রাট আকবার ফতেহপুর সিক্রি নামক স্থানে একটি ইবাদাতখানা স্থাপন করেন। এই ইবাদাতখানায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতদেরকে ডাকা হতো। তিনি তাঁদের আলোচনা শুনতেন। তবে ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনা তাঁর ভালো লাগতো না।

খৃস্টীয় ১৫৮২ সনে আকবার 'দীনে ইলাহী' নামে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন। এই ধর্মের কালেমা ছিলো ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবারো খালীফাতুল্লাহ। এই ধর্মের অনুসারীদেরকে বলা হতো চেলা। চেলাদের পাগড়িতে আকবারের প্রতিকৃতি শোভা পেতো। দরবারে 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' বলে সম্রাটকে কুর্নিশ করার রীতি চালু হয়। নতুন ধর্ম মতে মদ, সুদ ও জুয়া বৈধ বলে ঘোষিত হয়।

দেওয়ালী, দশোহরা, পুনম ও শিবরাত্রি পালনের ব্যবস্থা রাখা হয়। পর্দার বিধান নিন্দিত হয়। গরু যবাই নিষিদ্ধ হয়। নাচ-গানের ব্যাপক প্রসার ঘটানো হয়।

এই সময় শায়খ আহমাদ সরহিন্দি ১৯ বছরের একজন তরুণ। কিন্তু তিনি

আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আলকুরআন ও আস্ সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক ছিলো বিধায় তিনি দীনে ইলাহীর বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের কাজে হাত দেন। তিনি নিয়মিত শিক্ষা মাজলিস অনুষ্ঠিত করতেন। ছালাতুজ জুহর থেকে ছালাতুল আছর পর্যন্ত হতো সাধারণ অধিবেশন। ছালাতুল আছর থেকে ছালাতুল মাগরিব পর্যন্ত বসতো বিশেষ অধিবেশন। এইভাবে তিনি লোক তৈরির কাজ চালাতে থাকেন। তিনি ইসলামী বিষয়ে পণ্ডিত বলে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনামূলক চিঠি পাঠাতে থাকেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে গড়ে ওঠা তরুণ ব্যক্তিদেরকে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে লোকদেরকে ইসলামের সঠিক ধারণা দেওয়ার কাজ শুরু করেন।

খৃস্টীয় ১৬০৫ সনে আকবার মারা যান। পরবর্তী সম্রাট নুরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঁগীর দীনে ইলাহীর প্রচার চালাতে থাকেন।

শায়খ আহমাদ সরহিন্দি সম্রাটের নিকট, শাহজাদা খুররমের নিকট, সম্রাটের পারিষদগণের নিকট এবং সেনাপতিদের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে এবং তা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে দাওয়াতী চিঠি পাঠাতে থাকেন। তিনি প্রায় পাঁচশত দাওয়াতী চিঠি লিখেছিলেন।

বিদ'আত পন্থীরা তাঁর তৎপরতায় বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। শি'য়া প্রধানমন্ত্রী আসাদ খানের প্ররোচনায় তারা সম্রাটকে বলে যে শায়খ আহমাদ সরহিন্দি সারা দেশে তাঁর অনুসারীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন। তিনি সম্রাটকে মানেন না। তিনি নিজেই সম্রাট হতে চান। শিগগিরই তিনি বিপ্লব ঘটাবেন।

সম্রাট জাহাঁগীর শায়খ আহমাদ সরহিন্দিকে আগ্রার রাজ-প্রাসাদে ডেকে পাঠান। তিনি সম্রাটের নিকটবর্তী হলে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে বলা হলো ঃ 'সম্রাটকে কুর্শিশ করুন।'

তিনি বললেন, 'মুমিনের মাথা তো আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নত হয় না।'

ভীষণ রেগে যান জাহাঁগীর। তাঁকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।

তাঁকে বন্দি করে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দুর্গে বন্দি কয়েদীদের মধ্যে তিনি দাও'য়াতী কাজ শুরু করেন। বহু কয়েদী এবং কারারক্ষী তাঁর দারস শুনে খাঁটি মুমিন হিসেবে জীবন গড়ার শপথ নেয়।

এক বছর প্রলম্বিত হয় তাঁর জেল জীবন।

ইতোমধ্যে সম্রাট জাহাঁগীরের চিন্তায় বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি দীনে ইলাহীর প্রচার বন্ধ করে দেন। আকবারের প্রবর্তিত বহু রীতি ত্যাগ করেন। মুসলিম প্রধান শহরগুলোতে মাদরাসা এবং গ্রামগুলোতে মাকতাব স্থাপনের নির্দেশ দেন।

সম্রাট রাজ-প্রাসাদের পাশেই একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন এবং পারিষদবর্গকে নিয়ে ওই মাসজিদে ছালাত আদায় করা শুরু করেন।

শায়খ আহমাদ সরহিন্দি নাস্তিকতা ও শিরকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। সুফিবাদের নামে যেই নর্তন কুর্দন চলতো, সেই গুলোর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বিজাতীয় দর্শন ও ভক্তিবাদের অনিষ্ট সম্পর্কে মুসলিমদেরকে সতর্ক করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রশাসনের ওপর থেকে শি'য়া প্রভাব বিদূরিত হয়।

খৃস্টীয় ১৬২৪ সনে শায়খ আহমাদ সরহিন্দি সরহিন্দেই মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য যে শাহজাদা খুররম শায়খ আহমাদ সরহিন্দির দা'ওয়াতী চিঠি পড়ে ইসলামের অনুরাগী হয়ে ওঠেন।

খৃস্টীয় ১৬২৭ সনে সম্রাট জাহাঁগীরের মৃত্যুর পর শাহজাদা খুররম শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহজাহান নামে মসনদে বসেন। এই শাহজাহানই দিল্লী জামে মাসজিদ এবং লাহোর জামে মাসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লী জামে মাসজিদে খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি বুখারা থেকে একজন বিশিষ্ট আলিমকে নিয়ে আসেন।

খৃস্টীয় ১৬৫৮ সনে আওরঙ্গজেব সম্রাট হন।

তিনি শায়খ আহমাদ সরহিন্দির সেরা ছাত্র মোল্লা জীওয়ান (আহমাদ ইবনু

আবি সায়ীদ ইবনু উবাইদুল্লাহ)-কে তাঁর অন্যতম শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই মোল্লা জীওয়ানের কাছ থেকেই সম্রাট ইসলামের স্বচ্ছ সঠিক জ্ঞান লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে মোল্লা জীওয়ান ছয় বছর সম্রাটের সাথে থেকে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

আওরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতায় উপ-মহাদেশের মুসলিমদের মাঝে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে। তাঁরই নির্দেশে একদল বিশিষ্ট ইসলামী বিশেষজ্ঞ 'ফাতওয়া-ই-আলমগীরী' নামক গ্রন্থ রচনা করে মুসলিমদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন।

আওরঙ্গজেব মদ পান নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন। জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। নওরোজ (নব বর্ষ উৎসব), সম্রাটের জন্মোৎসব পালন এবং সম্রাটকে উপঢৌকন দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করে দেন। রাজ-প্রাসাদে সংগীতানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন এবং এক হাজার গায়ক-গায়িকাকে অবসর ভাতা দিয়ে বিদায় দেন।

জনগণের কল্যাণ বিবেচনায় তিনি আশি প্রকারের ট্যাকস রহিত করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। তার প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়তে শুরু করে। ❖

৮। আবুল ফাইয়াদ আহমাদ কুত্‌বুদ্দীন (শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্) (রাহিমাহুল্লাহ্) (খৃস্টীয় ১৭০৩-১৭৬৩)

খৃস্টীয় ১৭০৩ সনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) ষষ্ঠ মুগল সম্রাট মুহীউদ্দিন মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসন কালের একেবারে শেষভাগে দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

খৃস্টীয় ১৭৬৩ সনে দ্বিতীয় শাহ্ আলমের শাসনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর আব্বা শাহ্ আবদুর রাহীমের ওফাতের পর তিনি মাদরাসা রাহীমিয়ার প্রধান হন।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে সমাজ বিশ্লেষণ করার এবং চিন্তা-চেতনার ভ্রান্তি চিহ্নিত করার অসাধারণ যোগ্যতা দান করেছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ ছিলো 'খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন নাবুওয়াত' থেকে বিচ্যুতি। এই মূল বিষয়টি বুঝতে তাঁর একটুও কষ্ট হয়নি।

আশ্ শূরার অবিদ্যমানতার ফলে মুসলিম জনগণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে ধর্ণা দিতো। ওইসব ব্যক্তি তাঁদের উপলব্ধি অনুযায়ী এককভাবে সিদ্ধান্ত দিতেন। এইভাবে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের আবির্ভাব ঘটে। এটি ছিলো মুসলিমদের জন্য একটি সমস্যা।

গ্রীকদর্শন তথা ইউরোপীয় দর্শনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলো মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠী। তারা নানা ধরনের কু-তর্কে লিপ্ত ছিলো।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহর চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের জন্য কলম ধরেন। শাসকশ্রেণী, পারিষদবৃন্দ, সেনাপতিবৃন্দ, আলিম-সমাজ, সুফী সমাজ এবং জনগণকে তিনি আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর নিরিখে দিক নির্দেশনা দিতে থাকেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ্) মুসলিম উম্মাহকে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা সম্পন্ন একদল লোক তৈরি করেন।

খৃস্টীয় ১৭৬৩ সনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীয একদিকে মাদরাসা রাহিমীয়ার প্রধান, অন্যদিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহর হাতে গড়া ব্যক্তিদের নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করতে থাকেন।

খৃস্টীয় ১৮১৮ সনে শাহ আবদুল আযীয দেহলবী 'তারগীবে মুহাম্মাদীয়া' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনিই ছিলেন এই সংগঠনের প্রধান।

খৃস্টীয় ১৮২৪ সনে শাহ আবদুল আযীয দেহলবীর মৃত্যু হলে 'তারগীবে মুহাম্মাদীয়ার' নেতৃত্ব সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীর ওপর ন্যস্ত হয়।

তিনি গোটা ভারত সফর করে এই সংগঠনের কর্মী রিক্রুট করেন। অতপর তিনি বালুচিস্তান হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছেন। সেখান থেকে পৌঁছেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে। ব্যাপকভাবে তিনি দা'ওয়াতী তৎপরতা চালাতে থাকেন।

এই সময় শিখ নেতা রণজিৎ সিং গোটা পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিরাট অংশ এবং কাশ্মীরের বিরাট অংশ নিয়ে একটি শিখ রাষ্ট্র গঠন করেন। এই রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী ছিলো লাহোর এবং দ্বিতীয় রাজধানী ছিলো পেশাওয়ার।

আর খৃস্টীয় ১৭৫৭ সন থেকে বাংলা-বিহার-উড়িশায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর শাসন।

সাইয়েদ আহমাদ বেরেলভী তাঁর কর্মস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন দুর্গম পাহাড়ী এলাকা। প্রতিরক্ষার দৃষ্টিতে এলাকাটি ছিলো খুবই সুরক্ষিত।

সেখানকার জনসংখ্যার শতকরা একশত ভাগ ছিলো মুসলিম।

খৃস্টীয় ১৮২৭ সনের ১১ই জানুয়ারী 'সামাহ' নামক স্থানে আলিম এবং গোত্রীয় সরদারদের এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবেশে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলভী আমীর নির্বাচিত হন। সামাহ-কে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। তিনি ইসলামী শারী'য়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন।

শিখ রাষ্ট্র প্রধান রণজিৎ সিং ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেন নি। অচিরেই এই নবগঠিত রাষ্ট্রের ওপর শিখদের হামলা শুরু হয়। যুদ্ধে হারজিত চলতে থাকে।

খৃস্টীয় ১৮৩১ সনের ৬ই মে জুমাবার সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী শাহ ইসমাঈল ও অন্যান্য মুজাহিদদেরকে নিয়ে হাজারা জিলার উত্তর-পূর্ব কোণে কুনার নদীর সন্নিকটবর্তী বালাকোট নামক একটি পাহাড়বেষ্টিত স্থানে অবস্থান করছিলেন।

বিশ্বাসঘাতক পাঠান সরদার খাদি খানের সহযোগিতায় সেনাপতি শের সিং বিশাল শিখ বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় ও হামলা চালায়।

সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী ও বহু সংখ্যক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

খৃস্টীয় ১৮৩১ সনে তারগীবে মুহাম্মাদীয়ার আমীর হন মৌলভী বেলায়েত আলী। বিহার প্রদেশের পাটনাতে স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

খৃস্টীয় ১৮৩৯ সনে রণজিত সিং মারা গেলে শিখ রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। ইংরেজরা আরো বেশি অগ্রবর্তী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

খৃস্টীয় ১৮৪৫ সনে মৌলভী বেলায়েত আলীর ভাই মৌলভী ইনায়েত আলী সীমান্ত প্রদেশের ফতেহগড় নামক স্থানকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। ফতেহগড়ের নাম রাখা হয় ইসলামগড়।

খৃস্টীয় ১৮৪৬ সনের ৯ই অকটোবর মৌলভী বেলায়েত আলী সেখানে পৌঁছলে তিনি আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হন। এবার সরাসরি ইংরেজদের সাথে মুসলিম মুজাহিদদের যুদ্ধ বাঁধে। বিভিন্ন রণাংগণে যুদ্ধ চলতে থাকে।

খৃস্টীয় ১৮৫১ সনে মৌলভী ইনায়েত আলী দুই মাস দিল্লীতে অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি গোপনে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর-এর সাথে সাক্ষাত করেন বলে জানা যায়।

খৃস্টীয় ১৮৫২ সনের ৫ই নভেম্বর মৌলভী বেলায়েত আলী সিত্তানাতে মৃত্যুবরণ করেন। আমীরুল মুমিনীন হন মৌলভী ইনায়েত আলী।

খৃস্টীয় ১৮৫৭ সনে মিরাট সেনা ছাউনীর সৈন্যরা বিদ্রোহ শুরু করে। বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে সবুজ পতাকা হাতে নিয়ে সাধারণ মানুষও রাজপথে নেমে আসে।

সিত্তানা থেকে মৌলভী ইনায়েত আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন। যুদ্ধের এক পর্বে তিনি নারিনজি নামক স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই সময় তাদেরকে বেশ কিছু দিন গাছের পাতা, বাকল, শিকড় খেয়ে বাঁচতে হয়। মৌলভী ইনায়েত আলীর এক ছেলে ও এক মেয়ে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিনি নিজে জ্বরে

আক্রান্ত হন। পরে রক্তামাশয় দেখা দেয়।

খৃস্টীয় ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে মৌলভী ইনায়েত আলী মৃত্যুবরণ করেন। ইংরেজরা প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে সিত্তানা দখল করে নেয়।

খৃস্টীয় ১৮৫৮ সনে ইংরেজরা শিখ এবং নেপালের গুর্খা সৈন্যদের সহযোগিতায় ভারতের আযাদী সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। হাজার হাজার সৈনিককে ফাঁসি দেওয়া হয়।

খোঁজাখুজি করে তারগীবে মুহাম্মাদীয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করা শুরু হয়।

খৃস্টীয় ১৮৬৪ সনে অনুষ্ঠিত হয় আম্‌বালা ট্রায়াল।

২রা মে মৌলভী ইয়াহইয়া আলী, মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী এবং মুহাম্মাদ শাফীকে মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। লে. গভর্ণর দণ্ড পরিবর্তন করে তাঁদেরকে সারা জীবনের জন্য আন্দামান দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত দেন।

তাঁদেরকে শিকল পরিয়ে হাঁটিয়ে আমবালা থেকে লাহোরে আনা হয়। সেখান থেকে করাচী, করাচী থেকে বোম্বাই ও পরে আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

খৃস্টীয় ১৮৬৫ সনে অনুষ্ঠিত হয় পাটনা ট্রায়াল।

অন্যতম সেরা সংগঠক মৌলভী আহমাদুল্লাহকে গ্রেফতার করে ১৬ই জানুয়ারী বিচারের সম্মুখীন করা হয়। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অবশ্য হাইকোর্ট এই দণ্ড পরিবর্তন করে তাঁকে সারা জীবনের জন্য আন্দামানে নির্বাসনের দণ্ড দেয়।

খৃস্টীয় ১৮৬৫ সনের জুন মাসে মৌলভী আহমাদুল্লাহকে আন্দামান পৌঁছানো হয়।

এরপর হাজী মুবারক আলীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন এগিয়ে চলে। ❖

৯। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) (খৃস্টীয় ১৭০৪-১৭৯২)

খৃস্টীয় ১৭০৪ সনে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব আল আরাবীয়ার উয়াইনা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করনে।

উয়াইনাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি আল মাদীনা আসেন। অতপর উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে থাকেন। অবশেষে বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিয়ে তিনি ফিরে আসেন উয়াইনা।

আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর আলোকে মুসলিম সমাজকে নিরীক্ষণ করে তিনি দারুণভাবে ব্যথিত হন। সর্বত্রই তিনি দেখতে পান ইসলামের প্রতি উদাসীনতা, ইসলাম থেকে বিচ্যুতি এবং শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। সমাজপতিদের বিরাট অংশ মদপান ও অশ্লীল কর্মকান্ডে অভ্যস্ত ছিলো। বিত্তবান ব্যক্তিরা ডুবে ছিলো বিলাসিতায়।

কবরের ওপর সৌধ নির্মাণ, মৃত বুযর্গ ব্যক্তিদের নামে নযর-নিয়ায দেওয়া, এমনকি কবর পূজা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিলো।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব 'কিতাবুত তাওহীদ' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। উয়াইনা এসে তিনি আট মাস নিরবে কাটান। অতপর কিতাবুত তাওহীদের দারস দেওয়া শুরু করেন। সত্য সন্ধানী কিছু লোক তাঁর সহযোগী হন। শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত লোকেরা বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা তাঁর দুশমনে পরিণত হয়। এমনকি আপন ভাই সুলাইমান এবং চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন তাঁর নির্ভেজাল ইসলামের উপস্থাপনা সহ্য করতে পারেন নি। তাঁরা শায়খের দুশমনদের সাথে হাত মিলান।

বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে। তিনি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে নিজের বাড়ি ঘর ও সহায়-সম্পত্তি পেছনে ফেলে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ব্যথিত মনে উয়াইনা ত্যাগ করেন। তখন আল আরাবীয়ার বিভিন্ন অঞ্চল আমীরদের দ্বারা শাসিত ছিলো। তিনি বিভিন্ন

অঞ্চলের আমীরদের সাথে সাক্ষাত করে তাঁদের নিকট ইসলামের আসল রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা চালাতে থাকেন। স্বার্থপর আমীরগণ তাঁর দা'ওয়াত কবুল করতে ব্যর্থ হন। বেশ কয়েকটি স্থানে বিফল হয়ে তিনি পৌঁছেন দিরাইয়াহ।

খৃস্টীয় ১৭৪৫ সনে দিরাইয়াহর আমীর মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ও দীর্ঘ আলাপ হয়। তিনি আমীরের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরেন। বিশেষ করে আত্ তাওহীদ সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আমীরের নিকট উপস্থাপন করেন। আমীর মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদ অনুপ্রাণিত হন এবং প্রকৃত ইসলামের আলোকে তাঁর শাসিত ভূ-খণ্ডটি গড়ে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবকে তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেন।

দিরাইয়াহতে নির্মিত হয় একটি নতুন মাসজিদ। এটি ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব এই মাসজিদে নিয়মিত দারস দিতেন। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে একদল নিষ্ঠাবান মুসলিম যাঁদের চিন্তা- চেতনা ছিলো শিরক ও বিদ'আতের ছোঁয়ামুক্ত।

বিদ'আতপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে বানোয়াট কাহিনী রটনা করে বড়ো বড়ো আলিমদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা চালায়। অপপ্রচার শুনে আল কাসিম অঞ্চলের বেশ কিছু আলিম তাঁর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন পেশ করেন। একটি দীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে তিনি তাঁদের প্রশ্নের জওয়াব দেন।

তিনি লেখেন, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে- আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত যেইসব অভিমত পোষণ করেন আমার অভিমতও তা-ই।

আমি আল্লাহ্, রাসূল, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, পুনরুত্থান ও তাকদীরের ওপর ঈমান রাখি।

আমি আল কুরআন ও আল হাদীছে উল্লেখিত আল্লাহর গুণাবলীকে কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা না করে যেইভাবে বর্ণিত হয়েছে সেইভাবেই স্বীকার করে থাকি, আল্লাহর নির্গুণ হওয়া স্বীকার করি না বরং তাঁর গুণাবলীকে অনুপম ও সৃষ্টির সাথে তুলনা বিহীন বলে জানি। আল কুরআন আল্লাহর বাণী এবং কাদীম অনাদি। আল্লাহ আল কুরআনকে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের (ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর নাযিল করেছেন। আমি আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্ধারণের বাইরে কিছুই ঘটতে পারে না বলে বিশ্বাস করি। সকল কাজ আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়, তাঁর তাকদীরের সীমা লংঘন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক শাফা'আতের ওপর ঈমান রাখি। আমি বিশ্বাস করি যে মুমিনগণ রবের দর্শন লাভে ধন্য হবেন। আমি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে বিশ্বাস করি। যেই ব্যক্তি তা স্বীকার করে না তাঁকে মুমিন বলে স্বীকার করি না। আল্লাহর ওলীগণের কারামাত ও কাশফের কথা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁদের কাউকে প্রভুত্বের অধিকারী ও ইবাদাতযোগ্য মানি না।

আমি কোন মুসলিমকে কাফির বলি না ও তাদের কাউকে ইসলামের বহির্ভূত বলে মনে করি না।

আমি ফাসিক নেতার পতাকাতলে সমবেত হয়ে জিহাদ করা এবং তাদের জামায়াতে ছালাত আদায় করা জায়েয মনে করি। আমি দাজ্জালের পতন না হওয়া পর্যন্ত তলোয়ারের জিহাদ বিধান বলবৎ ও ফারয মনে করি।

আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক সাক্ষ্যদান এবং ব্যবহারিক আচরণ– এই তিনটিকে আমি ঈমানের অংশ মনে করি। নেক আমলের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং বদ আমল দ্বারা ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে বিশ্বাস করি।

শারী'য়াহর নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়ের আদেশ প্রদান এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ সকল মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।"

[তারীখে নাজদ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৯]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব তখনকার প্রখ্যাত আলিম আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ আল বাগদাদীকে একটি চিঠিতে লেখেন, "আমি লোকদেরকে আত্ তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছি। বিপদ-আপদে মৃত বুযর্গ ব্যক্তি ও ওলীদেরকে ডাকা ও তাঁদের কাছে সাহায্য চাওয়াকে নিষেধ করেছি। তাঁদের কবরে নযর-নিয়ায ও মানত দিতে এবং কবরকে সাজদা করতে বাধা দিয়েছি।.........

আমি আমার অনুসারীদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামায়াতের সাথে আদায়, যাকাত আদায় প্রভৃতি ফারয কাজগুলো সম্পন্ন করা, সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা, মাদক দ্রব্যাদি পরিহার করা এবং নিফাককে ঘৃণা করা শিক্ষা দিয়েছি। দেশের বড়ো লোকেরা এই গুলোর বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পেরে আমার প্রচারিত আত্ তাওহীদের নানা রূপ কদর্থ করতে শুরু করেছে এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমার দুর্নাম রটাচ্ছে।

যেই ব্যক্তি জেনে বুঝে ইসলাম পরিহার করে কিংবা রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে কটুক্তি করে এবং তাঁর অনুসরণে বাধা দেয়, আমি কেবল তাকেই কাফির বলে থাকি। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে উম্মাহর অধিকাংশ লোকই এমন নয়।"

[তারীখে-নাজদ, পৃষ্ঠা : ৫৪-৫৬]।

আমীর মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদ রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। আর শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ব্যক্তি গঠনের কাজ করতেন।

খৃস্টীয় ১৭৬৫ সনে আমীর মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদ মৃত্যুবরণ করেন। নতুন আমীর হন তাঁর পুত্র আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদ। নতুন আমীরও মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবকে উপদেষ্টা পদে বহাল রাখেন।

খৃস্টীয় ১৭৯২ সনে তাঁর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন।

খৃস্টীয় ১৮০৩ সনে আমীর আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদ একজন শিয়া আততায়ীর অতর্কিত হামলায় শাহাদাত বরণ করেন।

খৃস্টীয় ১৮৮৪ সনে হাইল-এর আমীরের হাতে দিরাইয়াহর আমীর আবদুর রাহমান ইবনুল ফায়সাল পরাজিত হয়ে কুয়েত পালিয়ে যান।

খৃস্টীয় ১৯০১ সনে আবদুল আযীয ইবনু আবদির রাহমান (দ্বিতীয় আবদুল আযীয) ৪০ জন জানবাজ উষ্ট্রারোহী যোদ্ধা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে রিয়াদ দখল করেন। অতপর তাঁর সুযোগ্য সেনাপতিত্বে আল আরাবীয়ার বিভিন্ন অঞ্চল তাঁর রাষ্ট্রভুক্ত হয়।

খৃস্টীয় ১৯২৬ সনে আবদুল আযীয ইবনু আবদির রাহমান ইবনুল ফায়সাল

ইবনুস সাউদ "আল মামলুকাতুল আরাবীয়া আস্ সাউদীয়া" গঠন করেন। এই আমীর আবদুল আযীযই আধুনিক সাউদী আরবের স্থপতি। আগের মতোই আস্ সাউদ বংশের লোকেরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অপরদিকে, শিক্ষা ও বিচার বিভাগ পরিচালনা করেন শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবের বংশধরেরা।

যদিও সাউদী আরবে "খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন নাবুওয়াত' কায়েম হয়নি, ইসলামের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবর্তিত হওয়ায় দেশটি শান্তি ও নিরাপত্তার দেশ হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। দীনী পরিবেশ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবের বংশধরেরা এবং তাঁর চিন্তাধারার অনুসারীরা এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছেন। ❖

১০। শায়খ হাসানুল বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) (খৃস্টীয় ১৯০৬-১৯৪৯)

খৃস্টীয় ১৯০৬ সনে মিশরের শাসক আব্বাস হিলমী পাশার শাসনকালে শায়খ হাসানুল বান্না মাহমুদিয়া নামক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। শায়খ হাসানুল বান্না লক্ষ্য করেন যে ইউরোপীয় চিন্তাধারা মুসলিমদের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তিনি মুসলিমদেরকে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

তিনি ইসমাঈলিয়াতে কর্মরত ছিলেন।

খৃস্টীয় ১৯২৮ সনে তিনি ছয়জন ইসলামী ব্যক্তিত্বকে তাঁর বাসায় দা'ওয়াত দেন। দীনী বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শায়খ হাসানুল বান্না তাঁদের সামনে তাঁর চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেন এবং সমাজ অংগনে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁর সাথে একমত হন। তাঁরা সাত জন মিলে একটি সংগঠন কায়েম করেন। নাম রাখেন, 'আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন।'

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ ছিলেন শায়খ হাসানুল বান্না, হাফিয আবদুল হামিদ, আহমাদ আল হাসরী, ফুয়াদ ইবরাহীম, আবদুর রাহমান হাসবুল্লাহ, ইসমাঈল ইয্য এবং যাকী আল মাগরিবী।

হাসানুল বান্না ভালো করেই জানতেন যে ইসলামী সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আল জিহাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ। তিনি দা'ওয়াতী কাজে নেমে পড়েন। অন্যদেরকেও এই কাজে নিয়োজিত করেন।

হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়া শহরের বাসায় বাসায় গিয়ে লোকদের সাথে আলাপ করতেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য

রাখতেন। এইভাবে তিনি তিন বছর কাজ করেন। বেশ কিছু লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়।

ইখওয়ান সদস্যগণ বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়িতে যেতেন, মাসজিদে গিয়ে বক্তব্য রাখতেন, শিল্প এলাকার কফি খানায় গিয়ে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যেও বক্তব্য রাখতেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা কায়েম হতে থাকে। গড়ে ওঠতে থাকে নিজস্ব মাসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

খৃস্টীয় ১৯৩২ সনে শায়খ হাসানুল বান্না কায়রোতে বদলি হন। ইসমাঈলিয়া থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয় কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়।

এবার মহিলা শাখাও গঠিত হয়। নাম রাখা হয় 'আল আখাওয়াত আল মুসলিমাত।'

খৃস্টীয় ১৯৩৯ সনে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ইংল্যাণ্ড চাচ্ছিলো মিসর তার পক্ষে যুদ্ধে নামুক। অথচ ইংল্যান্ডের পক্ষে যুদ্ধে নামার অর্থ ছিলো তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা। অর্থাৎ রণাংগনে মুসলিম সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদেরকেই হত্যা করতে হবে। শায়খ হাসানুল বান্না হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। অবশ্য তখনকার প্রধানমন্ত্রী আলী মাহির পাশা এবং প্রধান সেনাপতি আযীয আলী আল মিসরীও ইংরেজদের আবদার রক্ষা করার পক্ষে ছিলেন না।

ইংরেজরা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। কিং ফারুক ইংরেজদের চাপের নিকট নতি স্বীকার করেন। তিনি প্রধান সেনাপতি আযীয আলী আল মিসরীকে দীর্ঘ ছুটিতে পাঠিয়ে দেন। কিছুকাল পর প্রধানমন্ত্রী আলী মাহির পাশাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

খৃস্টীয় ১৯৪০ সনে মিসর ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধে নামে।

শায়খ হাসানুল বান্না এবং সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল হাকিম আবেদীনকে গ্রেফতার করা হয়। আল ইখওয়ানের পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্য সব পত্রিকায়ও আল ইখওয়ানের খবর ছাপা যাবে না

বলে নির্দেশ জারি হয়। মিছিল ও জনসভা নিষিদ্ধ করা হয়।

কিছুকাল পর শায়খ হাসানুল বান্না ও আবদুল হাকিম আবেদীনকে মুক্তি দেওয়া হয়।

খৃস্টীয় ১৯৪৩ সনের গোড়ার দিকে আল ইখওয়ান থেকে বিচ্যুত হয়ে কতিপয় সদস্য একটি গুপ্ত সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনী এখানে ওখানে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আর সরকার সব দোষ চাপায় আল ইখওয়ানের ওপর। এদের সম্পর্কে শায়খ হাসানুল বান্না একটি সার্কুলার লেটারে বলেন, 'এরা আল ইখওয়ানও নয়, আল মুসলিমূনও নয়।'

খৃস্টীয় ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিন বিভক্তকরণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের বুকে একটি ইয়াহুদী রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফিলিস্তিনের গ্র্যান্ড মুফতী আমীন আলহুসাইনী ইয়াহুদীদের মুকাবিলার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের ডাক দেন। এই ডাকে অন্যদের মতো আল ইখওয়ানও সাড়া দেয়। হাসানুল বান্না অবসর প্রাপ্ত সেনা অফিসার মাহমুদ লাবীবকে ফিলিস্তিন পাঠান। তিনি ফিলিস্তিনী মুসলিম যুবকদেরকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজরা তাঁকে ফিলিস্তিন ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

খৃস্টীয় ১৯৪৮ সনে ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনে জেঁকে বসে। ইসলামী চিন্তা নায়কগণ জিহাদের ডাক দেন। শায়খ হাসানুল বান্না আহমাদ আবদুল আযীযের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক ফিলিস্তিনে পাঠান। তাঁরা রণাংগনে ইয়াহুদীদের অগ্রগতি থামিয়ে দেন।

তাঁদের সাফল্য ইংরেজদের তাবেদার কিং ফারুকের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ফাহমী আন নুকরাশী পাশার মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। সরকারের নির্দেশে প্রধান সেনাপতি ফুয়াদ ছাদিক আল ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভেংগে দেন।

খৃস্টীয় ১৯৪৮ সনের ৮ই ডিসেম্বর আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।

শায়খ হাসানুল বান্না ছাড়া অন্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। সব সম্পদ জব্দ করা হয়। অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আল ইখওয়ানের সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। চিরুনি অভিযান চালিয়ে সারাদেশ থেকে হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। জেলে তাদের ওপর চালানো হয় ভয়ানক নির্যাতন।

শায়খ হাসানুল বান্নাকে গ্রেফতার করা হয়নি। তিনি বলেন, তাঁকে গ্রেফতার না করার অর্থ হচ্ছে তাঁর মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়েছে।

খৃস্টীয় ১৯৪৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী। শায়খ হাসানুল বান্না ইয়াং মুসলিম এসোসিয়েশনের একটি মিটিংয়ে বক্তব্য রেখে রাস্তায় নেমে একটি ট্যাকসীতে উঠতে যাচ্ছিলেন। এই সময় আততায়ীর গুলি এসে লাগে তাঁর বুকে। রক্তাক্ত দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কয়েকজন লোক তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহর প্রেমিক আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে পৌঁছে যান।

শায়খ হাসানুল বান্নার লাস বাড়িতে আনা হয়। বাড়ি ঘেরাও করে রাখে সরকারী বাহিনীর লোকেরা। মাত্র কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর কাফন, জানাযা ও দাফনে অংশ নিতে দেওয়া হয়।

শায়খ হাসানুল বান্নার শাহাদাতের পর আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের মুর্শিদে 'আম হন হাসান আল হুদাইবি।

খৃস্টীয় ১৯৫০ সনের শুরুতে সাইয়েদ কুত্ব আমেরিকাতে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনে যোগদান করেন। তাঁকে এই সংগঠনের মুখপত্র সাপ্তাহিক আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

খৃস্টীয় ১৯৫২ সনে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের পথ ধরে মিসরের প্রেসিডেন্ট হন জামাল আবদুন নাসের।

আল ইখওয়ান আশা করেছিলো তিনি ইসলামের পক্ষে কাজ করবেন। দুঃখের বিষয়, প্রেসিডেন্ট নাসের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা সাজলেন। এতে আল ইখওয়ান তাঁর কড়া সমালোচনা করে।

খৃস্টীয় ১৯৫৪ সনে কে বা কারা প্রেসিডেন্ট নাসেরকে হত্যা করার চেষ্টা করে। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে হাজার হাজার ইখওয়ান কর্মীকে জেলে পুরে নির্যাতিত করা হয়।

সাইয়েদ কুত্ব ও আরো ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

খৃস্টীয় ১৯৬৫ সনে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

খৃস্টীয় ১৯৬৬ সনের ২৯শে অগাস্ট সাইয়েদ কুত্ব, মুহাম্মাদ হাওয়াশ ও আবদুল ফাত্তাহ ইসমাঈলকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়।

এতো কিছুর পরও মানযিলের পর মানযিল অতিক্রম করে ইখওয়ানুল মুসলিমূন সামনে এগুতে থাকে। ❖

১১। বাদিউযযামান সাঈদ নুরসী (রাহিমাহুল্লাহ) (খৃস্টীয় ১৮৭৭-১৯৬০)

খৃস্টীয় ১৮৭৭ সনে উসমানী খালীফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনকালে তুর্কীর বিতলিস অঞ্চলের নূরস নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন সাঈদ নুরসী।

খৃস্টীয় ১৮৯২ সনে তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন।

তাঁকে মারদিনে গ্রেফতার করে বিতলিস পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে বিতলিসের গভর্নর তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর বাড়িতে মেহমান রূপে রেখে দেন।

কিছুকাল পর তিনি ওয়ান প্রদেশের গভর্নর তাহির পাশার বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। এই সময় পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এটি ছিলো বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত সেক্রেটারী ফর কলোনীজ মিঃ জর্জ গ্ল্যাডস্টোনের ভাষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট। ঐ ভাষণে তিনি বলেন, "So long as the muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take if from them or make them lose their love of it."

"অর্থাৎ 'যতোদিন মুসলিমদের হাতে আল কুরআন থাকবে, আমরা তাদেরকে বশ করতে পারবো না। হয় আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নিতে হবে অথবা তারা যেন এর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

এই ভাষণে আলকুরআনের প্রতি বৃটিশ সরকারের মনোভাব এবং অনুসৃতব্য পলিসি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের এই ভাষণ সাঈদ নুরসীকে আরো বেশি সজাগ করে তোলে। তিনি সংকল্প ব্যক্ত করেন, "I shall prove and demonstrate to the world that the Quran is an undying and inextinguishable sun."

অর্থাৎ ' আমি প্রমাণ করবো এবং দুনিয়াকে দেখাবো যে আল কুরআন মৃত্যুহীন এবং নিভিয়ে ফেলা যায় না এমন এক সূর্য।'

এই সময় তুর্কীতে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত 'কমিটি অব ইউনিয়ন

এন্ড প্রোগ্রেস' ক্ষমতায় ছিলো। রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলে একটি সেনা বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্যালোনিকা থেকে সৈন্য এনে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। সরকার ধারণা করে, এই বিদ্রোহের পেছনে ছিলো ইত্তিহাদ-ই-মুহাম্মাদী জমিয়তী। এই সংগঠনের নেতা হাফিয দারবিশসহ প্রায় দুই শত জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন ছিলো সন্দেহে সাঈদ নুরসীকে গ্রেফতার করে মিলিটারি ট্রাইবুনালে হাজির করা হয়। যেই কক্ষে তাঁর বিচার হচ্ছিলো সেই কক্ষের জানালা দিয়ে পনর জনের ঝুলন্ত লাস দেখা যাচ্ছিল।

ট্রাইবুনালের প্রিজাইডিং অফিসার সাঈদ নুরসীকে বলেন, "আপনি শারী'য়া চাচ্ছেন? যারা শারী'য়া চায় তারা ঐ লোকগুলোর মতো ফাঁসিতে ঝুলে।"

সাঈদ নুরসী বলেন, "আমার যদি এক হাজার জীবন থাকতো, আমি শারী'য়ার এক একটি অংশের জন্য আমার জীবনগুলো কুরবান করে দিতাম। কারণ শারী'য়াই হচ্ছে সমৃদ্ধি, কল্যাণ, সুবিচার ও সততার পথ।"

তিনি আরো বলেন, "বীর ব্যক্তিরা অপরাধ করে না। যদি তারা অভিযুক্ত হয় তারা শাস্তিকে ভয় পায় না। আমি যদি অন্যায়ভাবে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হই, আমি দুইজন শহীদের পুরস্কার পাব। আমি যদি জেলখানায় থাকি, তবে সম্ভবত জেলখানাই হচ্ছে স্বৈরাচারী শাসকের অধীনে সবচে' বেশি আরামদায়ক স্থান। যালিম হয়ে বাঁচার চেয়ে মাযলুম হয়ে মৃত্যুবরণ করা উত্তম।"

বিদ্রোহের সাথে সাঈদ নুরসীর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়নি বিধায় ট্রাইবুনাল তাঁকে মুক্তি দেয়।

খৃস্টীয় ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। একপক্ষে ছিলো বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া। অপর পক্ষে ছিলো জার্মানী ও তুর্কী। যুদ্ধের এক পর্বে রুশ সৈন্যরা তুর্কীর বিতলিস অঞ্চল আক্রমণ করে। এই নাজুক সময়ে সাঈদ নুরসী সরকারের অনুমতি নিয়ে একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে রণাংগনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি রুশ সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। দুই বছর বন্দী থাকার পর তিনি বন্দিদশা থেকে পালাতে সক্ষম হন।

খৃস্টীয় ১৯১৮ সনে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল পৌছেন। তাঁকে বীরোচিত

সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। স্বর্ণের তৈরি ওয়ার মেডাল দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় উসমানী খালীফা ছিলেন পঞ্চম মুহাম্মাদ মাহমুদ রাশাদ। যুদ্ধ শেষে খালীফা হন ষষ্ঠ মুহাম্মাদ ওয়াহিদউদ্দীন।

খৃস্টীয় ১৯১৯ সনে আনাতোলিয়ায় ইয়াং তুর্কস শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদেরকে দমন করার জন্য সেনা বাহিনীর জাঁদরেল অফিসার মুস্‌তাফা কামাল পাশাকে পাঠানো হয়। তিনি বিদ্রোহীদের দলে ভিড়ে যান।

ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ইয়াং তুর্কস একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন করে। চেয়ারম্যান হন কামাল পাশা। এই নির্বাহী পরিষদ আংকারাকে রাজধানী করে আনাতোলিয়া শাসন করতে থাকে।

খৃস্টীয় ১৯২২ সনে কনস্ট্যান্টিনোপলে আংকারা সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। উসমানী খালীফা ষষ্ঠ মুহাম্মাদ ওয়াহিদউদ্দিন দেশ ত্যাগ করে বৃটেনে চলে যান।

খৃস্টীয় ১৯২২ সনে মুসতাফা কামাল পাশা রিপাবলিকান পিপলস পার্টি গঠন করেন। ১৯৪৬ সন পর্যন্ত (২৪ বছর) এটিই ছিলো তুর্কীর একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল।

খৃস্টীয় ১৯২৩ সনে কামাল পাশা তুর্কীকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। তিনি হন তুর্কীর প্রেসিডেন্ট। প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন ইসমত ইনুনু।

খৃস্টীয় ১৯২৪ সনে মুস্‌তাফা কামাল পাশা উসমানী খিলাফাতের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

কামাল পাশা ছিলেন ইসলামের কট্টর দুশমন। যা কিছু ইসলামী আইন তখনো প্রচলিত ছিলো তিনি সেইগুলো বাদ দিয়ে সুইস কোড প্রবর্তন করেন। তিনি পর্দা প্রথার বিলোপ সাধন করেন। সহ-শিক্ষা প্রবর্তন করেন। ইসলামী শিক্ষালয়গুলো বন্ধ করে দেন। আরবীতে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ করেন। আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করেন। পাগড়ি ও ফেজ টুপি পরিধান নিষিদ্ধ করেন। হ্যাট পরিধান বাধ্যতামূলক করেন। সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ করেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সাঈদ নুরসীকে দারুণভাবে ব্যথিত করে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, বলিষ্ঠতা এবং কল্যাণময়তা

"রিসালা-ই-নূর" শীর্ষক পুস্তিকা সিরিজের মাধ্যমে অপরাপর মানুষের সামনে তুলে ধরবেন।

তিনি মাউন্টএরেক নামক স্থানে এসে যারনাবাদ নদীর উৎসের সন্নিকটে একটি ডেরা নির্মান করে সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। জুমাবার তিনি নুরসিন মাসজিদে এসে আত্ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য রাখতেন।

তিনি বলতেন, "আমার লক্ষ্য হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদ মজবুতভাবে গড়ে তোলা। যদি বুনিয়াদ মজবুত হয়, কোন তুফানেই তা ভেংগে পড়বে না।"

খৃস্টীয় ১৯২৫ সনে একদল সৈন্য এসে সাঈদ নুরসীকে তাঁর বাসস্থান থেকে তুলে নিয়ে যায়।

প্রথমে ইজমির, পরে আন্তালিয়া এবং আরো পরে বুরদুর নামক স্থানে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়।

খৃস্টীয় ১৯২৬ সনে সরকার সাঈদ নুরসীকে ইসপারটায় পাঠিয়ে দেয়। বিশ দিন পর সরকার তাঁকে সেখান থেকে বারলা নামক একটি ছোট্ট পল্লীতে নির্বাসনে পাঠায়।

সরকার তাঁকে এই গ্রামে আট বছর থাকতে দেয়। এই গ্রামে সাঈদ নুরসী গড়ে তোলেন প্রথম নূর মাদ্রাসা। এখানে অবস্থানকালে তিনি রিসালা-ই-নূর শীর্ষক একশত ত্রিশটি পুস্তিকা রচনা করতে সক্ষম হন।

ইসলাম বিদ্বেষী সরকারের শাসনকালে তাঁর পুস্তিকাগুলো মুদ্রণের কোন উপায় ছিলোনা। তিনি মুখে বলতেন। কয়েকজন ছাত্র তা লিখে নিতো। প্রথমে যারা লিখতো তারা কপি করে সেইগুলো আরো কিছু লোকের নিকট পৌঁছাতো। এইভাবে এক গ্রুপ থেকে আরেক গ্রুপের নিকট এইগুলো হস্তান্তরিত হতো। শেষাবধি এই কপিগুলোর সংখ্যা ছয় লাখ ছাড়িয়ে যায়। রিসালা-ই-নূরের প্রভাব পড়তে থাকে মানুষের ওপর। নিরবে সৃষ্টি হতে থাকে ইসলামী জাগরণ।

খৃস্টীয় ১৯৩৫ সনের ১২ই মে সাঈদ নুরসী ও তাঁর ৩১ জন সহকর্মীকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে একটি লরীতে তুলে এসকিশেহির জেল খানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কোর্টে মামলা শুরু হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য জনগণের ধর্মীয় আবেগ ব্যবহার এবং ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার অভিযোগ আনা হয়।

সাঈদ নুরসীকে এগার মাস ও পনর জন সহকর্মীকে ছয় মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্যরা মুক্তি পায়।

জেল খেটে বের হওয়ার পর তাঁকে কাসতামনুতে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

খৃস্টীয় ১৯৩৮ সনে মুস্তাফা কামাল পাশা মারা যান। প্রেসিডেন্ট হন ইসমত ইনুনু। পূর্বের মতোই ইসলামের বিরোধিতা চলতে থাকে।

খৃস্টীয় ১৯৪৩ সনে সাঈদ নুরসীকে গ্রেফতার করে ডেনিযলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কোর্টে হাজির করা হয়।

সাঈদ নুরসী আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। কোর্ট তাঁর ও তাঁর সাথী বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেয়।

খৃস্টীয় ১৯৪৪ সনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তাঁকে আফিত্তনে নির্বাসিত করা হয়। তিন সপ্তাহ পর তাঁকে নির্বাসিত করা হয় আমিরদাগ।

খৃস্টীয় ১৯৪৮ সনের শুরুতে সাঈদ নুরসীকে বারবার রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখন তাঁর বয়স সত্তরের উর্ধে। এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে একবার চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখে অবান্তর প্রশ্ন করা হয়।

ঐ বছরই আফিত্তন কোর্ট তাঁকে বিশ মাসের এবং তাঁর সহকর্মীদেরকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়।

খৃস্টীয় ১৯৪৬ সনে তুর্কীতে বহুদলীয় রাজনীতি চালু হয়।

খৃস্টীয় ১৯৫০ সনের সাধারণ নির্বাচনে মুসতাফা কামাল পাশার গঠিত এবং ইসমত ইনুনু পরিচালিত রিপাবলিকান পিপলস পার্টির ভরাডুবি হয়। নব গঠিত ডিমোক্রেটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে।

খৃস্টীয় ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে সাঈদ নুরসীর অনুসারীগণ ডিমোক্রেটিক পার্টিকে ব্যাপকভাবে ভোট প্রদান করে বিজয়ী করেন।

খৃস্টীয় ১৯৫৭ সনে আংকারা ও কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় রিসালা-ই-নূর। বিপুল সংখ্যায় রিসালা-ই-নূর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

খৃস্টীয় ১৯৬০ সনে সাঈদ নুরসী উরফা আসেন। তিনি তখন দারুণ অসুস্থ। রাতে তাঁর শরীরে খুব জ্বর আসে। কথা বলার শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেলেন।

২৩শে মার্চ রাত তিনটার দিকে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। উরফাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

১২ই জুলাই কামালিস্ট সেনাবাহিনীর একটি দল উরফা এসে কবর থেকে সাঈদ নুরসীর লাস তুলে নিয়ে যায়।

বাদীউয্যামান সাঈদ নুরসী তুর্কীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকুতোভয়ে লড়াই করেন, বন্দি হয়ে রুশ কারাগারে দুই বছর নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেন, পালিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল আসার পর তাঁকে বীরোচিত সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং ওয়ার মেডাল প্রদান করা হয়। এই সাঈদ নুরসীই যখন ইসলামের পতাকা সমুন্নত করার প্রয়াসে অবতীর্ন হন, তখন কামালিস্টদের দৃষ্টিতে তিনি হয়ে যান সবচে' বেশি বিপজ্জনক ব্যক্তি। এমনকি তাঁর কবর মুসলিমদের প্রেরণার উৎসে পরিণত হতে পারে এই আশংকায় প্রায় চার মাস পর কবর থেকে তাঁর লাস তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে আবার কবরস্থ করা হয়।

আধুনিক তুর্কীর ইসলামী নব জাগরণের প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন বাদীউয্যামান সাঈদ নুরসী।

উল্লেখ্য যে খৃস্টীয় ১৯১৯ সনে গ্রীস তুর্কীর স্মার্না (ইজমির) অঞ্চলে সৈন্য নামিয়ে সামরিক অভিযান শুরু করে। গ্রীস পশ্চিম আনাতোলিয়া দখল করে নিতে চেয়েছিলো, ফলে গ্রীসের সাথে তুর্কীর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুবক আদনান মেন্দারেস সেনা বাহিনীতে যোগদান করে তুর্কীর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের পর তাঁকে ওয়ার মেডাল দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

খৃস্টীয় ১৯৪৬ সনে তুর্কীতে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হলে জালাল বায়ার, আদনান মেন্দারেসসহ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডিমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন।

খৃস্টীয় ১৯৫০ সনের নির্বাচনে ডিমোক্রেটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং আদনান মেন্দারেস প্রধানমন্ত্রী হন।

খৃস্টীয় ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সনের নির্বাচনেও এই দলটি বিজয়ী হয়। জালাল বায়ার প্রেসিডেন্ট এবং আদনান মেন্দারেস প্রধানমন্ত্রী হন। আদনান মেন্দারেস সরকার তুর্কী ভাষার স্থলে আরবী ভাষায় আযান প্রদানের অনুমতি দেয়। তালাবদ্ধ কয়েক হাজার মাসজিদ ছালাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। একবার এক ভাষণে আদনান মেন্দারেস বলেন, পার্লামেন্ট সদস্যগণ চাইলে দেশে শারী'য়া প্রবর্তিত হতে পারে। ইসলামের প্রতি তাঁর এই নমনীয়তা তাঁর জন্য বিপদ ডেকে আনে।

খৃস্টীয় ১৯৬০ সনে জেনারেল জামাল গুরসেলের নেতৃত্বে 'কামালিস্ট' সামরিক বাহিনী একটি অভ্যুত্থান ঘটায়।

সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত । আদনান মেন্দারেস সরকার ইসলামের দিকে ঝুঁকে সংবিধান বিরোধী কাজ করেছে– অভিযোগ এনে মিলিটারী ট্রাইবুনালে প্রধান কয়েকজন ব্যক্তির বিচার শুরু হয়।

মিলিটারী ট্রাইবুনাল প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারেস, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফাতিন রুস্তু জুরলু এবং অর্থমন্ত্রী হাসান পোলাতকানকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করে।

খৃস্টীয় ১৯৬১ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর আদনান মেন্দারেস ও অপর দুইজন মন্ত্রীকে ইমরালি জেলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়।

এতো কিছু করেও ইসলাম-বিদ্বেষীরা তুর্কীর গণ-মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত ইসলামের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারেনি। ❖

১২। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহিমাহুল্লাহ)
(খৃস্টীয় ১৯০৩-১৯৭৯)

খৃস্টীয় ১৯০৩ সনে বৃটিশ শাসিত ভারতের হায়দারাবাদ রাজ্যের (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ) আওরঙ্গাবাদ শহরে একাদশ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের শাসনকালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জন্ম গ্রহণ করেন।

খৃস্টীয় ১৯৭৯ সনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হকের শাসনকালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

খৃস্টীয় ১৯১৮ সনে পনর বছর বয়সে বিজনৌর থেকে প্রকাশিত আল মাদীনা পত্রিকার সম্পাদকীয় স্টাফের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর কর্ম জীবন শুরু হয়।

অতপর সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকার সম্পাদক ও মুসলিম পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি কর্তব্য পালন করেন।

খৃস্টীয় ১৯২৫ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ (১৯১৯ সনে গঠিত) আল জমিয়ত নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করে। সম্পাদক নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

খৃস্টীয় ১৯২৫ সনে 'আর্য সমাজ' নামক একটি গোঁড়া হিন্দু সংগঠনের অন্যতম নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো ঃ উপমহাদেশের মুসলিমদের পূর্ব পুরুষগণ ছিলো হিন্দু। মুসলিম শাসকদের চাপে পড়ে তারা হিন্দুত্ব ত্যাগ করে মুসলিম হয়। এখন মুসলিমদের উচিত হিন্দুত্বে ফিরে আসা।

এই আন্দোলন ছিলো মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রচারনায় উত্তেজিত হয়ে একজন মুসলিম ১৯২৬ সনে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। এতে গোটা ভারতে মুসলিমবিরোধী দাংগা শুরু হয়। হিন্দু নেতারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে, আল কুরআনের বিরুদ্ধে, আল কুরআনের অন্যতম মৌলিক পরিভাষা আল জিহাদ-এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন।

খৃস্টীয় ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সনে মোট চব্বিশ সংখ্যায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আল জমিয়ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'আল জিহাদ ফিল

ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করে আল জিহাদের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেন।

খৃস্টীয় ১৯২৮ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের (১৮৮৫ সনে গঠিত) 'এক জাতি তত্ত্বের' প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর এই ভূমিকা সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। ফলে তিনি আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন।

খৃস্টীয় ১৯৩২ সনে হায়দারাবাদ থেকে আবু মুহাম্মাদ মুছলিহ "মাসিক তারজুমানুল কুরআন" নামে একটি ইসলামী পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। সম্পাদক নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

এক বছর পর এই পত্রিকার মালিকানাও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তারজুমানুল কুরআনের প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লেখেন, "এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা ও মানুষকে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবার জন্য আহ্বান জানানো। বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল কুরআনের নিরিখে দুনিয়ায় বিস্তারশীল চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা-সংস্কৃতির নীতিমালার ওপর মন্তব্য করা, বর্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর বিধানগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি নির্দেশ করা। এই পত্রিকা মুসলিমদেরকে এক নতুন জীবনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে।"

প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে এই পত্রিকা বিভিন্ন বিষয়ে উপ-মহাদেশের মুসলিমদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়ে উপকৃত করেছে

খৃস্টীয় ১৯৪০ সনের ২২, ২৩ ও ২৪ মার্চ লাহোরের মিন্টু পার্কে অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের (১৯০৬ সনে গঠিত) সম্মেলন। এই সম্মেলনে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে দাবি জানানো হয় যে উপ-মহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে মুসলিমদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এই প্রস্তাবই লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এই ধারণা দিচ্ছিলেন যে

পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু মুসলিম লীগ ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান ইসলামী ব্যক্তি গঠনের কর্মসূচি হাতে নেয় নি। এই বিষয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর কথায় কান দেন নি।

খৃস্টীয় ১৯৪০ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর "আনজুমানে তারীখ ওয়া তামাদ্দুন' নামক সংস্থার উদ্যোগে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্র্যাচি হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এক দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

বিষয় ছিলো, "ইসলামী হুকুমাত কিস্ তারাহ্ কায়েম হুতি হায়।" এই ভাষণেরই বাংলা অনুবাদ "ইসলামী বিপ্লবের পথ।" এই ভাষণের একাংশে তিনি বলেন, "এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন সব লোকের যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ-ক্ষতি পার্থিব লাভ-ক্ষতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যারা সর্বাবস্থায় সেই সব আইন কানুন, বিধি-বিধান ও কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে যা তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে। যাদের চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব ও কামনা বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে যাদের গর্দান সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা-বিদ্বেষ ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে যাদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধন-সম্পদের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর নয়। এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার হাতে এলেও যারা নিখাদ আমানাতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা না ঘুমিয়ে রাত কাটাবে। আর জনগণ যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ তত্বাবধানে নিজেদের জান-মাল-ইয্যাতের যাবতীয় বিষয়ে থাকবে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন একদল লোকের যারা কোন দেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদ ধ্বংস সাধন, যুলম-নির্যাতন, গুণ্ডামী-বদমায়েসী ও ব্যভিচারের ভয়ে ভীত হবে না। বরং বিজিত দেশের

মানুষেরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জান-মাল-ইয্যাতের ও নারীদের সতীত্বের হিফাযাতকারী রূপে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হবে যে তাদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক-চারিত্রিক উৎকর্ষ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে গোটা দুনিয়া হবে তাদের প্রতি আস্থাশীল।এই ধরনের, কেবলমাত্র এই ধরনের লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ইসলামী রাষ্ট্র।'

আর এই ধরনের লোক তৈরির অভিপ্রায়ে একটি সংগঠন কায়েম করার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাসিক তারজুমানুল কুরআনে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে খৃস্টীয় ১৯৪১ সনের ২৫ ও ২৬ অগাস্ট একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রায় দেড় শতের মতো লোক এসেছিলেন। আলাপ-আলোচনার পর টিকে থাকেন ৭৫ জন। এই ৭৫ জন লোক নিয়েই ২৬ অগাস্ট জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়।

তিনি একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া পেশ করেন। তা অনুমোদিত হয়। এর ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আমীর নির্বাচিত হন।

প্রথম সদস্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের একাংশে তিনি বলেন, "জামায়াতে ইসলামীতে যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদেরকে এই কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে, জামায়াতে ইসলামীর সামনে যেই কাজ রয়েছে তা কোন সাধারণ কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাদেরকে পাল্টে দিতে হবে।

দুনিয়ার নীতি-নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিটি কিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। দুনিয়ায় আল্লাহদ্রোহিতার ওপর যেই ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তা বদলিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর কায়েম করতে হবে। সকল শাইতানী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম।"

পঁচাত্তর জন সদস্যের সামনে দাঁড়িয়ে "দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা পাল্টে দেবার" সংকল্প ব্যক্ত করা প্রমাণ করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একজন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তারজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে, একের পর এক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক রূপটি মানুষের সামনে তুলে ধরছিলেন। তাঁর অবদান বহু ব্যাপক। তবে তিনটি অবদান অতি বড়ো।

প্রথমটি হচ্ছে– খৃস্টীয় ১৯৪১ সনের ২৬শে অগাস্ট জামায়াতে ইসলামী গঠন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে– খৃস্টীয় ১৯৪২ সনে তাফসীর তাফহীমুল কুরআন রচনা শুরু করা যা খৃস্টীয় ১৯৭২ সনে সমাপ্ত হয়।

তৃতীয়টি হচ্ছে– খৃস্টীয় ১৯৪৬ সনে ছাত্র অংগনে ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারণের জন্য স্বতন্ত্র ছাত্র সংগঠন কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

খৃস্টীয় ১৯৪৭ সনের ১৪ই অগাস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

খৃস্টীয় ১৯৪৭ সনের ২৩শে ডিসেম্বর ইসলামী জমিয়তে তালাবা নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠিত হয়।

উপ-মহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সময় জামায়াতে ইসলামীর রুকন সংখ্যা ছিলো ৬২৫ জন। দেশ ভাগ হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীকে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান নামে দুইটি সংগঠনে বিভক্ত করা হয়।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ২৪০ জন রুকন এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ৩৮৫ জন রুকন নিয়ে কাজ শুরু করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলাকালে নেতৃবৃন্দ ওয়াদা করেছিলেন যে তাঁরা পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলবেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁরা তাঁদের ওয়াদা বেমালুম ভুলে গেলেন। তাঁরা বৃটিশ অথবা আমেরিকান মডেলের সংবিধান রচনার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ প্রয়াস রুখে দাঁড়ান।

খৃস্টীয় ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে করাচীর জাহাংগীর পার্কে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম রাজনৈতিক জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঘোষণা করলেন যে সংবিধান রচনার দায়িত্ব প্রাপ্ত গণ-পরিষদকে ঘোষণা করতে হবে–

১। সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আর সরকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবে।

২। ইসলামী শারী'য়া হবে দেশের মৌলিক আইন।

৩। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোকে পরিবর্তন করে ইসলামের সাথে সংগতিশীল করা হবে।

৪। ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই শারী'য়ার সীমা লংঘন করবে না।

এইভাবে সূচিত হয় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন।

উল্লেখ্য যে খৃস্টীয় ১৯৪৮ সনে রফী আহমাদ ইন্দোরী, কারী জলিল আশরাফ নদবী, খুরশিদ আহমাদ বাট এবং মাওলানা আবদুর রহীমকে নিয়ে ঢাকাতে জামায়াতে ইসলামীর শাখা গঠিত হয়।

খৃস্টীয় ১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের স্থপতি মিঃ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মৃত্যু বরণ করেন।

খৃস্টীয় ১৯৪৮ সনের ৪ঠা অকটোবর জন নিরাপত্তা আইনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও আরো কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

লক্ষ্য ছিলো ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

বিশ মাস জেলে থাকার পর তিনি ও তাঁর সাথীরা মুক্তি পান।

খৃস্টীয় ১৯৫১ সনের ২১শে জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর প্রচেষ্টায় করাচীতে দেশের সেরা আলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৈরি হয় ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি নামে একটি মূল্যবান দলীল।

খৃস্টীয় ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কাদিয়ানীদের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য করাচীতে সর্বদলীয় একটি মিটিং হয়। মিটিংয়ে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধ ডাইরেকট এ্যাকশন চালানোর রহস্যজনক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জামায়াতে ইসলামী গোড়া থেকেই শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমে বিশ্বাসী ছিলো। অতএব জামায়াতে ইসলামী সর্বদলীয় কমিটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এদিকে স্থানে স্থানে দাংগা-হাংগামা শুরু হয়ে যায়।

খৃস্টীয় ১৯৫৩ সনের ৬ই মার্চ লাহোরে সামরিক শাসন জারি করা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়।

২৮শে মার্চ উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মিঞা তুফাইল মুহাম্মাদ, মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয, চৌধুরী মুহাম্মাদ আকবার এবং সাইয়েদ নকী আলীকে গ্রেফতার করা হয়।

সামরিক ট্রাইবুনালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিচার শুরু হয়। ৮ই মে অর্থাৎ গ্রেফতারীর দশ দিনের মাথায় সামরিক ট্রাইবুনাল তাঁকে তড়িঘড়ি ফাঁসির হুকুম দেয়।

কনডেমনড সেলে ক্রন্দনরত ছেলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'বাচ্চা, রোতা হায় কেঁও। হায়াত আওর মাউতকা ফায়সলা হোতা হায় আসমান মে যমীন মে নেহি।' (ছেলে, কাঁদছো কেন? জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হয় আসমানে, যমীনে নয়।)

দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সরকার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

খৃস্টীয় ১৯৫৫ সনের ২৯শে এপ্রিল দুই বছর একমাস কারাবাসের পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুক্তি লাভ করেন।

খৃস্টীয় ১৯৬১ সনে কিং আসসাউদের আমন্ত্রনে তিনি রিয়াদ পৌঁছেন। কিং-এর অনুরোধে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যান তৈরি করেন। কিছুটা পরিবর্তন করে সেই প্ল্যান গৃহীত হয়। এর ভিত্তিতেই স্থাপিত হয় মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

খৃস্টীয় ১৯৬৩ সনের ২৫, ২৬ ও ২৭শে অকটোবর সরকারের নানাবিধ অসহযোগিতা সত্ত্বেও লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূগী উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করাকালে সরকারের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডা বাহিনী সেই সম্মেলনে হামলা চালায়। শামিয়ানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ইসলামী বইয়ের দোকানগুলো তছনছ করে ফেলে। গুলি চায়ায়। মহিলাদের ক্যাম্পের দিকে বোতল নিক্ষেপ করে। গুলিতে আল্লাহ বকস নামে জামায়াতের একজন কর্মী শাহাদাত বরণ করেন।

খৃস্টীয় ১৯৬৪ সনের ৬ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইউব খানের নির্দেশে জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীসহ ৬০ জন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এবার তাঁদেরকে জেলে থাকতে হয় ৯ মাস। অতপর আল্লাহর মেহেরবানীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে তাঁরা মুক্তি লাভ করেন।

খৃস্টীয় ১৯৬৭ সনের ১১ই জানুয়ারী ছিলো ২৯শে রামাদান। কোথাও চাঁদ দেখা যায় নি। কিন্তু রাতে রেডিওর মাধ্যমে সরকার ঘোষণা করলো ঃ আগামী কাল ঈদ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও আরো কয়েকজন প্রখ্যাত আলিম এই ভিত্তিহীন ঘোষণার প্রতিবাদ করেন। ফলে ঈদ হয় দুই দিন। এতে প্রেসিডেন্ট আইউব খান খুব রেগে যান।

খৃস্টীয় ১৯৬৭ সনের ২৯শে জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুধী ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমকে গ্রেফতার করা হয়। তবে ১৫ই মার্চ তাঁদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বেশ কয়েক বছর ধরেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বেশ কিছু জটিল রোগে ভুগছিলেন।

খৃস্টীয় ১৯৭৯ সনের মধ্যভাগে তাঁর বড়ো ছেলে ডা. উমার ফারুক মওদূদী তাঁকে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা নিয়ে যান।

খৃস্টীয় ১৯৭৯ সনের ২২ শে সেপ্টেম্বর বাফেলো সিটিতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মৃত্যু বরণ করেন।

দেশে আনার পথে বিভিন্ন স্থানে তাঁর জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হয় লাহোরের গাদাফী স্টেডিয়ামে। প্রায় তিন লাখ লোক এতে শরীক হন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী দক্ষিণ এশিয়া উপ-মহাদেশের কয়েকটি দেশে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলা করে, মানযিলের পর মানযিল অতিক্রম করে, সামনে এগিয়ে চলছে। ❖

শেষের কথা

এইসব সত্যনিষ্ঠ আপোসহীন ব্যক্তিত্ব আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর অনাবিল শিক্ষাকে মানুষের সামনে তুলে ধরে চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের প্রয়াস চালিয়েছেন। আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর শিক্ষাকেই সমাজ অংগনের মূল ধারায় পরিণত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা নিখাদ সোনার সাথে এতোটুকু খাদ মেশাতে রাজি হন নি। কোন বিচ্যুতি ও বিকৃতিকে তাঁরা বরদাশত করেন নি। ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা ছিলো তাঁদের কামনা। তাঁরা খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন্ নাবুওয়াতের স্বপ্ন দেখতেন। এই লক্ষ্য হাছিলের জন্য এগুতে গিয়ে প্রতিকূলতার প্রচণ্ড আঘাত খেয়েও তাঁরা দৃঢ়পদ থেকেছেন। তাঁরা জানতেন, ইসলামী আন্দোলনের পথ ফুল বিছানো নয়। তাঁদের জীবন কথা যুগের পর যুগ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদেরকে প্রেরণা যোগাতে থাকবে। ❖

--o--

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

978-984-8921-04-3